Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-4 Issue-1 July 2025

প্রসঙ্গ : কথকতা

অমরেশ বিশ্বাস

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/07/13_Amaresh-Biswas.pdf

সারসংক্ষেপ: কথকঠাকুর সাধারণের উপযোগী সহজ-সরল ভাষাতে মানুষকে ধর্মকথা শোনাতেন। কথকথায় প্রথম দিকে 'ভাগবত'এর জনপ্রিয় আখ্যান প্রাধান্য পেলেও পরে 'রামায়ণ', 'মহাভারত'এর বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়। কথক শ্রোতাদের যে গ্রন্থের 'কথা' দিত, প্রতিদিন সেখান থেকে এক এক বিষয়ের কথকতা করা হতো। যেমন বামন ভিক্ষা, ধ্রুব চরিত্র, প্রহ্লাদ চরিত্র ইত্যাদি। ধর্মকথা পরিবেশনায় কথকের ব্যাখ্যা, আবৃত্তি, সংগীত, গল্পকথনে শ্রোতাবর্গ ভক্তিতে বিহ্বল হতো, তাঁরা শ্রোতাদের অশ্রুসিক্ত করতেন আবার কখনো হাসাতেন। কথকতা পূর্বে বাংলার লোকশিক্ষার জনপ্রিয় মাধ্যম ছিল। কথকতার প্রসঙ্গ আলোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়।

সূচক শব্দ: কথকতা, কথক, লোকশিক্ষা, সাট, ভাগবত, শ্রীধর কথক, ধরণী কথক, ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণি।

কথকতা বলতে এদেশে কথক কর্তৃক পৌরাণিক উপাখ্যানের বর্ণনা, ব্যাখ্যা বোঝানো হতো। কথক পুরাণ পাঠ করে, শ্লোক আওড়ে, গানের মাধ্যমে ধর্মকথা বলেন। একজন কথক অবশ্যই শাস্ত্রজ্ঞ হবেন, সুকণ্ঠ হবেন এবং গীতজ্ঞ হবেন। কথকতা কিন্তু পাঠ (পারায়ণ) থেকে ভিন্ন। পাঠ হতো সকালে। আর কথকতা বিকালে বা সান্ধ্য অনুষ্ঠানে। কোনো বিশেষ সংকল্প গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে ধনী গৃহস্থের বাড়িতে 'শ্রীমদ্ভাগবত' সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পাঠ করা হতো। এই ভাগবত পাঠ হতো সকালবেলায়। একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পাঠ করত, ধারক থাকত একজন ব্রাহ্মণ, তাঁর কাজ ছিল পাঠ যাতে অশুদ্ধ না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা। আর একজন শ্রাবক থাকত। গৃহকর্তা হয়তো শুনত কিন্তু একজন ব্রাহ্মণ শ্রোতা রাখতে হতো। পাঠক, ধারক, শ্রাবক — এই তিনজন ভাগবত পাঠে আবশ্যক হতো। এই ভাগবত পাঠে কেবল গ্রন্থ পড়া হতো, কোনো ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ হতো না। আর এক ধরনের ভাগবত পাঠ করা হতো যা মূলত ছিল ব্যাখ্যা-নির্ভর। ভাগবত পাঠ করে বাংলাতে নানা দিক থেকে সেটা বর্ণনা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করা হতো। এটা ছিল সান্ধ্য অনুষ্ঠান। এই ব্যাখ্যামূলক সান্ধ্য ভাগবত পাঠ থেকেই একসময় — সম্ভবত অষ্টাদশ শতকে কথকতার জন্ম হয়েছিল।[১] বাংলার বাইরে কথকঠাকুরকে ব্যাসজী বলে সম্মান করা হয়, রামায়ণ কথককে রামায়ণীজী বলা হয়।[২]

এদেশে সাধারণ মানুষ প্রায়শ সকালে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে। আর সকালবেলার পাঠকতা যেহেতু সংস্কৃতে হয় তাই তাদের বোধগম্য হয় না। কিন্তু কথকতা দেশীয় সহজ ভাষাতে হয়, তাই সাধারণের ভালো লাগে। মিষ্টি কথায় জনসাধারণকে ধর্মোপদেশ দেওয়ার এক বলিষ্ঠ উপায় কথকতা। সমাজের যে স্তরেরই লোক হোক না কেন কথকতা সবারই প্রিয়। বঙ্কিমচন্দ্র লোকশিক্ষার উপায় রূপে কথকতার বিশেষ উপযোগিতার কথা বলেছেন:

> **গ্রামে গ্রামে, নগরে, নগরে, বেদী পিঁড়ির উপর বসিয়া, ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস্ নুদুস্ কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ দধীচি আত্মসমর্পণবিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাট্না কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত — শিখিত যে ধর্ম্ম নিত্য, যে ধর্ম্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্ব সৃজন করিতেছেন, বিশ্ব পালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন। যে পাপ পুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে অহিংসা পরম ধর্ম্ম, যে লোকহিত পরম কার্য্য।[৩]**

বাংলায় কথকতার প্রবর্তক দুইজন ব্যক্তি — গদাধর শিরোমণি ও রামধন শিরোমণি। গদাধর শিরোমণি বর্ধমান জেলার সোনামুখী গ্রামে বাস করতেন, রাঢ় অঞ্চলের কথকেরা ছিল, তাঁর শিষ্য বা প্রশিষ্য। সকলেই প্রায় তাঁর রচিত 'সাট' অনুসারে কথকতা করতেন। রামধন শিরোমণি গোবরডাঙ্গার নিবাসী, তাঁর অনেকগুলি খ্যাতনামা শিষ্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে রামধনের ভ্রাতুষ্পুত্র ধরণী বাংলাতে খুব প্রসিদ্ধ হন। তাঁর কণ্ঠ অতি মধুর এবং তিনি সংগীতবিদ্যাতেও সমান পারদর্শী ছিলেন, তাই যে একবার তাঁর কথকতা শুনেছে সে আর ভুলতে পারেনি। কলকাতা ও তাঁর নিকটবর্তী এলাকার কথকেরা রামধনের 'সাট' অবলম্বনে কথকতা করেন।[৪] কথককে কতগুলি নির্বাচিত শ্লোক বা অংশ মুখস্ত রাখতে হতো — এগুলি 'সাট' বা সংলাপ-লেখন। কথকতার 'সাট'কে বলা হয় 'চূর্ণী'। 'চূর্ণী'তে মধ্যে মধ্যে কতগুলি আবশ্যকীয় সংকেত থাকে যথা — ভী-উ = ভীষ্ম উবাচ ইত্যাদি। 'চূর্ণী'র মধ্যে যেসব কথা থাকে তাকে চূর্ণক বলে। কথককে 'চূর্ণী' ছাড়াও রাত্রি বর্ণনা, মধ্যাহ্ন বর্ণনা, বসন্ত বর্ণনা, গ্রীষ্ম বর্ণনা, বেশ্যা বর্ণনা, দেশ বর্ণনা প্রভৃতি মুখস্থ রাখতে হয়। বর্ণনার আলাদা পুঁথিও থাকে। এসব বর্ণনাতে অনুপ্রাসের আড়ম্বরই বেশি। কথকতার সময়ে প্রয়োজন মতো বর্ণনা প্রয়োগ করতে হয়।[৫]

বাংলার গ্রামের জীবনকে সরস করে রাখতে অনেকখানি বহন করে সুর, সংগীত এবং কথার মাধ্যমে ভগবানের উপাসনায়। গ্রামের এক প্রান্তে থাকে কোনো বিশাল অশ্বত্থ বা বটগাছের নীচে ঠাকুরঘর আর বারোয়ারীতলা। সেখানে বসে কত কথকঠাকুর বছরের পর বছর কথকতা করেছেন। যা বাংলার পল্লী জীবনকে রসে সঞ্জীবিত করে শুদ্ধ ভাবপ্রেরণার দ্বারা পল্লী জীবনকে রক্ষা করেছেন। সরল ভাষায় ধর্মশিক্ষা দান করে জীবনের গতিকে সহজ-সরল-সুস্থ রেখেছেন। খ্যাতনামা সব কথকেরা অগণিত মানুষের মনে কথার সৌন্দর্যে ভাবের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। কণ্ঠের মাধুরী দিয়ে কবির কাব্যকে সার্থক করেছেন। মহাকবির বর্ণনাকে রূপ দিয়েছেন, আঙ্গিক অভিনয়ের মাধ্যমে, পদাবলির মধুর ছন্দে মানুষের কর্ণে অমৃতধ্বনি বর্ষণ করেছেন। এদের নিকটে প্রিয় কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ শুনতে আসা মানুষের মনে কী রসের উৎস্রোত ঘটত তার কিছু পরিচয় পরবর্তী অনুচ্ছেদে দেখা যাবে।

কথকতার প্রথমদিকে মূলত 'শ্রীমদ্ভাগবদ'এর বিশেষ জনপ্রিয় আখ্যান গ্রহণ করা হতো, পরে ক্রমশ 'মহাভারত' এবং 'রামায়ণ'এর আখ্যান গৃহীত হতে থাকে।[৬] যে গ্রন্থের 'কথা' দেওয়া হয়েছে প্রতিদিন সেখান থেকে এক এক বিষয়ের কথা হতো। যেমন বামন ভিক্ষা, ধ্রুব চরিত্র, প্রহ্লাদ চরিত্র ইত্যাদি।[৭] পূর্বে গ্রামের কোনো সমৃদ্ধ লোকের বাড়িতে শীত এবং বসন্তকালে দু-তিন মাস ধরে কথকতা হতো। কেউ তীর্থপর্যটন থেকে ফিরে 'কথা' দিতেন কিংবা পুজো উপলক্ষে বা অন্নপ্রাশন উপলক্ষে প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে কথকতা হতো।[৮] প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় বলেছেন, তখন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বা গরিব যাদের বাড়িতে একটু উঠোন আছে তারাই 'কথা' দিতেন।[৯] গৃহস্থের বাড়িতে কথকতার অনুষ্ঠানের জন্য আলাদা ব্যবস্থাপনা করা হতো। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কথকতা উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ি দেখেছিলেন : "কথকের জন্য যেমন সব জায়গায় ইটের বেদি হয়, এ বাড়িতে তাহা হয় নাই। একখানা বড়ো চৌকি ও একটা বড়ো তাকিয়া বেদির কাজ করিত। ঐ বেদির উপর একখানি পিতলের সিংহাসনে শালগ্রাম থাকিতেন, তিনি কথার প্রধান শ্রোতা। উঠানময় গালিচা ও শতরঞ্চ পাতা থাকিত; ব্রাহ্মণেরা গালিচায় বসিতেন, শূদ্রেরা শতরঞ্চে বসিত।"[১০]

দীনেন্দ্রকুমার রায় 'স্মৃতিকথা'তে তাঁদের গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের বাড়িতে কথকতা উপলক্ষে আয়োজনের বিবরণ দিয়েছেন: "বাড়ীর বাহিরের আঙ্গিনায় বাঁশের 'চ্যাটাই'এর আচ্ছাদন দ্বারা একটি প্রকাণ্ড মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার নীচে দক্ষিণপ্রান্তে কথক ঠাকুরের উপবেশনের জন্য একখানি কাঠের তক্তাপোষ সংস্থাপিত ছিল। সেই আসনে 'উত্তরমুখো' হইয়া বসিয়া কথক ঠাকুর কথকতা করিতেন, তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে একটি অনুচ্চ টুলে শালগ্রাম-শিলা সংস্থাপিত হইতেন। কথক ঠাকুরের সম্মুখে মৃত্তিকার উপর প্রসারিত সতরঞ্চিতে বসিয়া শ্রোতারা কথা শুনিতেন। আঙ্গিনার উত্তর-সীমায় একখানি খড়ো ঘর ছিল; তাহার সম্মুখে চিক টাঙ্গাইয়া পল্লী রমণীগণ সেই চিকের অন্তরালে বসিতেন।"[১১]

অন্য একটি স্থানে কথকতা উপলক্ষে ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিবরণ পাই, ‘‘নানা রঙের কাপড়ের তৈরি চন্দ্রাতপ তলে কথকতার বেদী। চাঁদোয়ার তলায় তক্তাপোষের ওপর গালিচা। গালিচাখানি কাশ্মীরি। কথকঠাকুরের বসার জন্য আগ্রা থেকে সুদৃশ্য ঝালর দেওয়া একখানা রেশমের আসন আনা হয়েছে। সম্মুখে পুরাণ রাখবার জন্য একটা ছোটো জলচৌকি তার ওপর লালসালুর কাপড় চাপা দেওয়া। ডান দিকে কোশাকুশী আর সব কুচো জিনিসপত্র রয়েছে। একখানা রেকাব এর উপর একটা নতুন গামছাও আছে, ঠাকুর কথার অবসরে সময় সময় চোখ-মুখ মার্জন করেন গামছা দিয়ে।’’[১২]

অনুষ্ঠান শুরু হলে কথকঠাকুর আসরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতৃবৃন্দ সবাই তাঁকে নমস্কার অভিবাদন করে। কথকঠাকুরের ললাট চন্দনচর্চিত, নাসিকাতে দীর্ঘ তিলক, শিখার গ্রন্থিতে ফুল। কথকঠাকুর ধীর পদক্ষেপে বেদীর সামনে প্রণত হয়ে আসনে উঠে বসেন। আসনের সম্মুখে প্রণাম করার কারণ হলো, এই আসন আসলে ব্যাসদেবের। সর্বপ্রথম এই আসন তাঁর পূজার সামগ্রী। আসন স্পর্শ করে তিনি কী যেন মন্ত্র উচ্চারণ করেন।[১৩] তুলট কাগজে লেখা, পাতলা কাঠের আবরণে আবৃত প্রায় এক হাত দীর্ঘ পুঁথিটি তিনি সামনে খুলে রেখে মাঝে মাঝে একটু করে দেখেন এবং আবৃত্তি করে তার ব্যাখ্যা করেন। কখনো গান করেন, ব্যাখ্যা উপলক্ষে নানা ধরনের গল্প বলেন। ভাবে বিভোর করেন, কখনো শ্রোতাগণকে হাসান কখনো অশ্রুজলে ভাসান।[১৪]

কথকঠাকুরের কণ্ঠের মধুময় কথা যখন শ্রোতাদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে, তখন অনেক ভক্তের চোখে জল গড়াবার উপক্রম হয়। কিছু মানুষ আসরে থাকে যারা খুব সহজেই ভাবে বিভোর হয়ে যায়। এসব মানুষ কথকঠাকুরের খুব প্রিয় হয়। তিনি কয়েকজন এরকম ভক্তকে খুব কাছে নিয়ে বসেন। কথকের মতে, এরাই তাঁর প্রকৃত সমঝদার শ্রোতা। এদের মুখ না দেখে তিনি কথাই বলতে পারেন না। কথাগুলি এমন সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো আর মাঝে মাঝে অঙ্গভঙ্গি সহযোগে গান, তাতে সাধারণ মানুষের ভারী আনন্দ হয়। কথকঠাকুর একটি বার করে কথা বলেন আর হাসিমুখে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করেন। তিনি হয়তো সমর্থন পাওয়ার জন্য এইভাবে তাকিয়ে দেখেন। অথচ মুখে কোনো বিকৃত ভাব নেই, শিরে কম্পন নেই, কণ্ঠের স্বর মধুর তীব্র, একটুও বেধে যায় না। অত্যন্ত পরিস্কার ভাবে তিনি ভাগবতীয় প্রসঙ্গ বলেন আর মাঝে মাঝে গান গেয়ে সবাইকে আনন্দে অভিষিক্ত করেন।[১৫]

কথকতার আসরে ধর্মকথা উপলক্ষে কথকের কথাতে সমকালীন প্রসঙ্গও উঠে আসে। যেমন একজন কথক দাতার প্রশংসা করছেন, তিনি বলেন, দান যে ব্যক্তি দেয় তার মনকে প্রসন্ন করে এবং যে পায় তাকেও পুষ্ট করে। দানের ফলেই যত হিতকর কর্মের প্রবর্তন। স্কুল, হাসপাতাল, লাইব্রেরি, বড়ো বড়ো আশ্রম, মন্দির, তীর্থস্থান সবকিছুই তো দানের উপর নির্ভর করে। তিনি বলেন, ‘‘এই যে আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছেন বারুয্যে মশায় — আমি সুন্দরী বাবুর কথাই বলছি; তিনি যদি মুক্ত হস্তে দান না কর্ত্তেন, তোমাদের গ্রামের হাসপাতালটির কোনো অস্তিত্ব থাকতো কি? আর এই শীলেদের পূর্ব্বপুরুষগণ কত দান পুণ্যই না করে গেছেন; আহা! তাদের কথা স্মরণ করলেও পুণ্য হয়।’’[১৬] প্রতিমা দেবীর লেখাতে পাই, স্বদেশীর সময়ে ক্ষেত্র চূড়ামণি কথক কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা এবং গীতার ব্যাখ্যা করে শ্রোতাদের হৃদয়কে রুদ্ররসে উত্তেজিত করে রেখেছিলেন।[১৭]

কথকঠাকুর শ্রোতাদের মর্জি বা রুচি অনুসারে বিষয় পরিবর্তন করতেন বা ধরাবাঁধা বিষয়ের বাইরে নতুন ‘কথা’ শোনাতেন। এক কথকঠাকুরের ক্ষেত্রে একবার গ্রামের প্রধান ব্রাহ্মণগণ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন। তারা বলেন, ‘‘রোজ ঐ একই পুরাণ কথা আর কী শুনবো, নিত্যই এক পূতনাবধ আর বামন ভিক্ষা। তার চাইতে ঘরে বসে আরাম করা ভালো।’’ এই কথাগুলি কথকঠাকুরের কানে পৌঁছায়। তিনি পরদিন প্রাতঃকালে খুবই বিনীতভাবে উপস্থিত হন ব্রাহ্মণের বাড়িতে। মধুর বাক্যে বলেন, ‘‘শুনলাম, আমার পুরাণ কথা বা পুরাতন কথা শুনতে আপনাদের আর আগ্রহ নেই। আপনারা যদি অনুগ্রহ করে একবার কথা শুনতে যান, আমি প্রতিজ্ঞা করছি,

আপনাদের নতুন কথা শোনাবো।"[১৮] সত্যই ওই আসরে কথকঠাকুর সেদিন স্বরচিত পদাবলি এবং অশ্রুতপূর্ব দৃষ্টান্ত দিয়ে কথা শুরু করেন। আসরে জ্ঞানীগুণী লোক থাকলে কথকঠাকুর কথার সুর অনেক সময় পাল্টে দিতেন। যারা লেখাপড়া করেছে এমন শ্রোতার সামনে শুধু সাধারণ গল্প বলে শেষ করা যায় না। কাজেই দু'চারটে তথ্যপূর্ণ গবেষণামূলক বা দার্শনিক কথার অবতারণা কথকঠাকুরকে করতেই হয়। এতে করে অবশ্য সাধারণ শ্রোতার অসুবিধা হয়। তবু কথকঠাকুরের বক্তব্য :

> **রোজই একসুরে গান আর গল্প করে যেতে হবে, তবে শাস্ত্র ব্যাখ্যার যেটুকু রহস্য সেটুকু আর কোথায় বলব? সাধুদের দল থেকে আজ আমায় একজন কে বলছিল — ঠাকুর কথাগুলি বড় শক্ত হয়ে যাচ্ছে। আজ যে একটাও গান হলো না কেবল কোথাকার কোন পণ্ডিত কি বলেছেন সে কথা, ওগুলি শুনে আমাদের কি হবে? আমরা চাই একটু প্রাণ জুড়ানো হরি-কথা যাতে চোখে জল আসে, প্রাণে ভরসা জাগে। এইসব তত্ত্বকথায় যে শুধু প্রাণ শুকিয়ে যায় কোনো ভরসা পাইনা। মনে হয় ভগবানের কাছ থেকে অনেক দূরে পড়ে আছি। আমাদের আর কোনো উপায় নেই। এ ভাবের কথা গ্রহণ কর্ব্বার কটা লোক আছে। কেন মুখুটি মশায়! এই তো আমি দেখ্‌ছি ছন্দা বাড়ী এসেই আমার কথাগুলি টুকে ফেলেছে এরকম একজনও যদি মনোযোগ করে আমার কথাগুলো ধরে রাখতে চেষ্টা করে, আমি মনে করি আমার কথকথার সেই-খানেই সফলতা।**[১৯]

অনেক কথক তাঁদের সমকালে খুব বিখ্যাত হয়েছিলেন। যেমন শ্রীধর কথক, কাব্যে, দর্শনে, অলংকারে, সংগীতে চরম প্রতিষ্ঠা লাভ করে — তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভায় তৎকালীন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিস্ময়াভূত চিত্তে তাঁর যশ ঘোষণা করেছিলেন। প্রসিদ্ধ কথক লালচাঁদ বিদ্যাভূষণ ছিলেন শ্রীধরের পিতামহ এবং কথক শিরোমণি অতুল্যচরণ ভট্টাচার্য তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। বহরমপুরে কালীচরণ ভট্টাচার্যের কাছে শ্রীধরের কথকতার শিক্ষা হয়। কোন্ অবস্থায় মানুষের কী ভাব হয় — কথকতার অঙ্গভঙ্গিতে, বাক্যরঙ্গে তার বিকাশ ঘটাতে হয়। কথকতা শিক্ষার সময় শ্রীধর কোনো বালকের হাতে সন্দেশ দিয়ে সেটা কেড়ে নিতেন, আর তাঁর দুটি বিশাল চোখের অন্তর্দৃষ্টিতে বালকের তখনকার ভাব মনে গেঁথে নিতেন। আবার কখনো বা বৃদ্ধের দন্তহীন মুখের কথার ভাব গ্রহণের জন্য, কোনো বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলে, নির্নিমেষ তার জিহ্বার গতিপ্রকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় গ্রহণ করতেন। সব রকমের ভাব অভিব্যক্তির বিকাশ-শিক্ষাতে তাঁর এতটাই সিদ্ধি ঘটেছিল যে, তিনি প্রসিদ্ধ কথকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।[২০]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধরণী কথকের প্রতিভা সম্পর্কে সম্যক পরিচিত ছিলেন। ধরণী কথক অসাধারণ কথকতা করতেন। তাঁর সুমিষ্ট অথচ গম্ভীর এবং উচ্চস্বরে প্রথম থেকেই আসর জমজমাট হয়ে যেত। তিনি যখন হাঁ করে গালের কাছে হাত এনে গান ধরতেন তখন সমস্ত লোক মুগ্ধ হয়ে যেত। ধরণী কথকের গান তিনি অনেক অল্প বয়সে শুনেছিলেন, গানের তখন কিছুই বুঝতেন না কিন্তু সেই সুর আজীবন তাঁর কানে লেগেছিল।[২১] কথক কালীনাথ ভট্টাচার্য খুব সদ্বক্তা ছিলেন। তাঁর সরস রসিকতাতে শ্রোতার দল প্রাণ ভরে হাসত, তাঁর মধুময় ধর্ম উপদেশ সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করত। তিনি যখন করুণ রসের অবতারণা করতেন তখন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার চোখ জলপূর্ণ হয়ে যেত।[২২] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহিম কথকের গুণের বিশেষ প্রশংসা করেছেন, মহিম কথক যখন পুঁথি থেকে একএকটি পাতা পড়ে যেতেন, তখন একএকটি ছবি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠত।[২৩]

কথকের মধুময় কথা, প্রাণ ভরা গান খুব সহজেই মানুষের মন হরণ করে নিতে পারত। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়ো পুত্র গুপুর মৃত্যুর পর তাঁদের বাড়ির সবাই খুবই বিষন্ন হয়ে পড়েন। দীনেশচন্দ্র সেন সেই সময় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলেন, যদি সান্ত্বনা পেতে চান তবে বাড়িতে কথকতা দিতে পারেন, কথকের কথায় শান্তি লাভ হতে পারে। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর আস্থাহীনভাবে প্রস্তাবে রাজি হলেও বাড়ির মেয়েরা সাগ্রহে সায় দেয়। কথক ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণি আসেন তাঁদের বাড়িতে। মাথায় মস্ত টাক, বিশাল হাঁ, গায়ের রং জলো কালির মতো, বিশাল ভুড়ি নিয়ে চটি পায়ে কথকঠাকুর বারংবার মুখ মুছতে মুছতে ব্যাসাসনে এসে বসেন। কিন্তু কথা বলবার অসাধারণ শক্তি ছিল তাঁর, প্রথম দিনেই আসর জমে গেল। বাড়িতে ছেলে, বুড়ো সকলেরই মৌতাত

ধরল। আসরে ক্ষেত্রচূড়ামণির কালো কণ্ঠে ঔজ্জ্বল্য প্রদান করে ফুলের মালা দুলতে থাকত এবং তিনি ধ্রুব, প্রহ্লাদ, জড়ভরত, দক্ষযজ্ঞ, রুক্মিণীহরণ, বকাসুর বধ প্রভৃতি কত পালাই যে বলে যেতেন তার অবধি ছিল না। তিনি কথায় কথায় ছবি এঁকে যেতেন, বর্ণনার ছটায় মেঘ, বৃষ্টি, বসন্ত-সমীরণ এবং পদ্মবন যেন চোখের সামনে উপস্থিত করতেন, কখনো শ্রোতাগণ অশ্রুসিক্ত হতো কখনো হাসির স্রোতে ভেসে যেত। এরূপ অপরূপ বক্তাকে পেয়ে, ধর্মের কথায় পৌরাণিক প্রসঙ্গো সকলের মন থেকে শোক ধীরে ধীরে মুছে যায়।[২৪]

কথকের সম্মোহনী ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় একটি গল্পে। রঘু ডাকাত এবং একজন বৃদ্ধ কথকের গল্প। প্রাণকিশোর গোস্বামীর ‘কথকতার কথা’ গ্রন্থ থেকে সে কাহিনি এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো : রঘু ডাকাতের কালে একজন এমন কথক ছিলেন যার গান শুনে মুগ্ধ হয়নি এরকম লোক ছিল না। একবার কথকতা করে বৃদ্ধ কথক অনেক টাকা, গহনা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। সংবাদ গেল রঘু ডাকাতের কাছে। সে পত্র দিয়ে জানাল কথকঠাকুরকে, অমুক তারিখে, অমুক বারে তারা সদলবলে আসবে। কথকতা করে যা আনা হয়েছে, সেগুলো স্বেচ্ছায় দিয়ে দিতে হবে, বাধা দিলে প্রাণহানির সম্ভাবনা। পুলিশে খবর দিলে গ্রামে বাস করা সম্ভব হবে না। পত্র পেয়ে কথক ভাবলেন বিরোধিতা করে রঘু ডাকাতের সঙ্গো পারা সম্ভব নয়। তাই তিনি যেদিন ডাকাত আসবার কথা, সেদিন বাড়ির আঙিনায় সুন্দর একটি আসর তৈরি করে কথকতার বেদী তৈরি করলেন। তার পাশে বাড়ির সমস্ত দামি জিনিস, গহনা, টাকা সাজিয়ে রাখলেন। এইভাবে সব সাজিয়ে তিনি পাশে বসে রুপোর আলবোলায় তামাক সেবন করতে করতে অতিথি ডাকাত দলের অপেক্ষা করলেন। যথাসময়ে রঘু ডাকাত এসে কথকের নির্বিকার ভাব দেখে বলল, “কী হে কথকঠাকুর কী মনে করেছ? একেবারে যে নিশ্চিন্ত দেবশর্মা হয়ে তামাক টানছ? তোমার মনের ভাবটি কী?” কথকঠাকুর ধীর শান্ত কণ্ঠে রঘু ডাকাতকে বললেন, “তুমি তো সবই নিয়ে যাবে, কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলতে চাই, আমি কী করে এইসব বহুমূল্য সামগ্রী রোজগার করে নিয়ে আসি, সেটি তুমি যদি দেখতে তাহলে হয়তো আমার পরিশ্রমলব্ধ এইসব জিনিস নিতে চাইতে না। এসেছ এগুলি নিয়ে যাও, তার আগে একবার শান্ত হয়ে বসে আমার কথা একটু শোন।” এরপর কথকতার বেদীতে বসে কথকঠাকুর একটি গান ধরলেন। ডাকাতের দল নিস্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগল। গানের সুরে কী কারুণ্য, কী তার প্রাণ ভরানো ভাব। ধীরে ধীরে রঘু ডাকাতের চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাথরের মতো কঠিন রঘু ডাকাতের চোখের কোণে জলের ধারা প্রবাহিত হলো। ধীরে ধীরে গানের মাধুরী সমস্ত ডাকাত দলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তারা একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ। এ গান তারা কোনোদিন শোনেনি। গানের প্রভাব অফুরন্ত, গান থেমে গিয়েছে কিন্তু রঘু ডাকাত এখনো চোখ খোলেনি, কিছুক্ষণ বাদে যখন সে বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেল, তখন সে আর আগেকার ডাকাত রঘু নেই। রঘু তখন বিগলিত চিত্তে জানাল, তার আর কথকের ধন-সম্পদে লোভ নেই, কথক তাকে পরমানন্দময় ভগবানের নামামৃত পান করিয়েছে। তাই আজ থেকে রঘু তার শিষ্য।

অনুরূপা দেবীর ‘মন্ত্রশক্তি’ উপন্যাসে কথকঠাকুরের, আসরে কথার স্রোতে ভাবের স্রোত ঢেলে দেবার দৃষ্টান্ত মেলে। কথকতার বিষয় ‘অভিমন্যু বধ’। সে ভাষা প্রাণস্পর্শী, স্বর একেবারে অনন্যসাধারণ। আসরে কথকের কথায় করুণার মন্দাকিনী ধারা পাষাণ ভেদ করে যাচ্ছিল। বীর বালকের অতুল সাহস, অমিত বিক্রম শ্রোতাদের উত্তেজিত করে রণক্ষেত্রে নিয়ে যাচ্ছিল। তারপর কী উৎকণ্ঠা, কী বিপুল উদ্বেগ, সপ্তরথী এসে অসহায় বালককে ঘিরে ধরল। অন্যায় সমরে ভারতের ভবিষ্যৎ-রবি অকালে অস্তমিত। আসরে শ্রোতাগণ নীরবে অশ্রুমোচন করছিল। কোনো কোনো পুত্রশোকাতুর জননী হৃদয়ের ব্যথা সংবরণ করতে না পেরে কেঁদে উঠছিল। অথচ কথকের মুখের কোনো পরিবর্তন হলো না। ঔপন্যাসিকের কথায়, “চিত্রকরের তুলি যেমন চিত্রের মুখে ভাব প্রদান করে, বর্ণ সমাবেশে ইন্দ্রলয় নন্দনকানন রচনা করে, কিন্তু নিজে সে ভাল সম্পদের ধারও ধারে না যে এতগুলো লোকের বক্ষতলে এতখানি শোকস্মৃতি জাগ্রৎ করিতেছিল, সে নিজে যেন তাহার মধ্যে ধরা ছোঁয়াও দেয় নাই।”[২৫]

কথকতা উপলক্ষে কথকদের উপার্জন মন্দ হতো না। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে কথকতা করত

আসা ক্ষেত্র-কথককে বামন ভিক্ষা প্রভৃতি পালায় বাড়ির মেয়েরা তাঁকে গহনা, মোহর ও টাকা দিতেন। দুই মাসে তাঁর ভালোই উপার্জন হয়েছিল।[২৬] একটি লেখাতে পাই, একজন কথকঠাকুর তাঁর প্রাপ্তি সম্পর্কে বলছেন, "এই সেবারে আমি রামপুরে বামন-ভিক্ষা কথকতার দিনে একদিনেই পেয়েছিলাম পঁচিশখানার উপরে বস্ত্র আর প্রায় চার মন চাল।"[২৭] কোনো কোনো ক্ষেত্রে কথক উপরিপ্রাপ্তির জন্য পুরমহিলাগণকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, "মাসকল কাল রামের বিবাহ, বিবাহে 'নকুতা' দিতে হয় — তা যেন মনে থাকে।" কিংবা কোনো সময় বললেন, "কাল লক্ষণ-ভোজন, সিধা আনিতে ভুলিও না।" কেউ নতুন কাপড় দিত, কেউ কাঠের বারকোশ পূর্ণ করে সিধা দিত, কেউ নতুন কাঁসার ডিশে নানারকম মিষ্টান্ন দিত, এছাড়া ডাব, পেঁপে, তরমুজ, কলা এবং বিবিধ তরকারিও তাঁকে উপহার দেওয়া হতো।[২৮]

আবার কথকের সঙ্গে ফুরণ হতো 'মালা নাবানী' কত টাকা নেবেন, সেটা অবস্থা বিশেষে পাঁচ টাকা থেকে পনের টাকা পর্যন্ত হতো। মালা নাবানী বিষয়টা হলো, কথকঠাকুর ব্যাসাসনে বসার পর, 'কথা' দিয়েছেন যিনি, তিনি এসে কথকঠাকুরের গলায় এক ছড়া গোড়ে মালা পরিয়ে দিলেন। কথকতা শেষ হলে কথকের গলা থেকে মালার ছড়াটা খুলে নিয়ে তিনি চুক্তি মতো টাকাটা হাতে দিয়ে দেবেন। শ্রোতাবর্গ কথকতায় সন্তুষ্ট হয়ে যে 'প্যালা' কথকঠাকুরের থালাতে দিয়েছে সেটা কথকের উপরিপ্রাপ্য। বাড়ির বয়স্ক মহিলারা কথকতা শুনতে গেলে সঙ্গে করে এক আনা, দুই আনা নিতেন কথকঠাকুরকে প্যালা দেওয়ার জন্য। মাসখানেক ধরে কথকতা চললে অনেক শ্রোতার প্যালা দিতে দিতে দুই পাঁচ টাকা খরচ হয়ে যেত।[২৯] কথকতার 'সাট' পড়বার নানা ঢং থাকে, সুর থাকে, বিশেষ ধরনের নাটকীয় ভঙ্গি থাকে। সেইজন্য কথকতার পুঁথির ভ্রম প্রমাদ শূন্য হওয়া খুবই জরুরি। বর্ণাশুদ্ধি ছাড়াও দীর্ঘ সমাসবন্ধ তৎসম পদের মিছিলে একআধটা শব্দ খণ্ডিত বা অতিরিক্ত হলে দ্রুত আবৃত্তির পক্ষে যতিভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

কথকতার পুঁথির পরিচয় সন্ধানে, একজন কথকের পুঁথিতে দেখা গেল, পুঁথির মলাট কাঠের ফলকের, তার উপরে শিল্পীর আঁকা সমুদ্রমন্থনের চিত্র। কথক নবীন হলেও তাঁর পুঁথিটি নতুন নয়। অনেক দিনের হাতে লেখা পুঁথি। 'ভাগবত'এর সবটা তুলট কাগজের এই পুঁথির মধ্যে সুন্দর অক্ষরে লেখা। ধারে ধারে তিন পুরুষের হাতের লেখার নিদর্শন, ক্ষুদ্র টীকা। যারা এই পুঁথিটি নিয়ে কথকতা করেছেন তাদের শিক্ষা ও রুচি অনুসারে নানা শাস্ত্রের প্রমাণ আশেপাশে সংগৃহীত। এরকম পুঁথি তিন-চার হাত বদল হয়ে অনেক তথ্যে পূর্ণ হয় আবার লিপিকর প্রমাদও সংশোধিত হয়ে যায়। কথকতার পুঁথির বিষয় যদি 'ভাগবত' হয়, তবে যে শুধু 'ভাগবত'এর মূল শ্লোক ও কোনো প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা থাকে এমন নয়। মাঝে মাঝে 'ভাগবত'এর মূল শ্লোকও আছে আবার প্রায়শ নানা গ্রন্থের প্রমাণ উপাখ্যান এবং তার সঙ্গে দৃষ্টান্তগুলির উল্লেখ করা থাকে। আবার পুঁথির অন্তর্গত নয় এইরকম খোলা পাতাও পুঁথির সঙ্গে থাকে। এই পাতাগুলির মধ্যে কোনোটা বনের বর্ণনা, কোনোটা পর্বতের বর্ণনা, কোনোটা রাজসভা কিংবা নগরের বর্ণনা, এই বর্ণনাগুলোর প্রয়োজন পড়ে কথা জমানোর জন্য।[৩০]

কথকতার পুঁথিকে বিষয় অনুসারে ভাগ করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পাওয়া যায় :
মুখবন্দনা; শিব-দুর্গা; রাম-লক্ষ্মণ-সীতা-হনুমান-রাবণ; শ্রীকৃষ্ণ-রাধা-যশোদা-বলরাম; নারায়ণ-নৃসিংহ-বামন; পরীক্ষিত-নারদ-শুকদেব-গৌরাঙ্গ; নাম (ঋষি, ভূত, দেশ ইত্যাদি); নারী (বেশ্যা, মোহিনী ইত্যাদি); কাল (প্রভাত, মধ্যাহ্ন ইত্যাদি); প্রকৃতি (বন, পুষ্পোদ্যান ইত্যাদি); পুরসভা; রথ; যুদ্ধসজ্জা-রণস্থল; বাদ্য দ্রব্য; সন্দেশাদি; মনঃ শিক্ষা ও গান।[৩১] কথকতার পুঁথি থেকে গদ্যে রাধার বর্ণনা — রাধা বর্ণনার প্রথম অংশ রূপবর্ণনা এবং শেষাংশ মহিমাজ্ঞাপক, যথা :

রক্তোৎপলদল চারুচরণতলনিন্দিতচম্পককলিকেব পাদাঙ্গুলীর শোভা...
ব্রজজনমনোহারিণী কৃষ্ণ ভক্তিদায়িনী নবরত রতি রঙ্গিনী মুরহর মনরঞ্জিনী
শমনগমনবারিনী দাস্যভক্তিদায়িনী কাল যাপনা করিতেছেন।[৩২]

বন, উদ্যান, সরোবর, সরোবরতীরে পুষ্পোদ্যান বর্ণনা রয়েছে — এই বর্ণনা আসলে ফুলের, বৃক্ষের, পাখির দীর্ঘতালিকা মাত্র এবং আবৃত্তির সুবিধার জন্য অনুপ্রাস অলংকারে সুশোভিত। যেমন উদ্যানের বর্ণনা :

> **উদ্যানের শোভার পরিসীমা নাই দীর্ঘেপ্রস্থে চতুর্থ চতুর্থ ক্রোশ চতুর্ভীতে বঞ্জুল কত্রীক মঞ্জুল হইয়াছে স্থানে ২ কচারি পরিসোধিত বিবিধ বিটপী স্থানে ২ সরোবর জলন্বাদি নিমিত নানা জাতীয় পাদপ ফলবান পুষ্পবান এবং ফলকুসুম শূন্য রশাল তাল তমাল শাল বড়াল হিন্তাল প্রিয়শাল পিয়াল সুজাল দেবাল শ্রীফল বকুল সরল কুরল গরল হিজোল পাঁদূল শতসার অশার মন্দার কর্ণিকার কোবিদার অর্জুন খর্জুন।**[৩৩]

পদ্যে কালীর বর্ণনা :

রক্তোৎপলদল নিন্দিত পদতল নবরবি নিন্দিত আভা।
স্বর্ণ বিনির্মিত নূপুর রঞ্জিত ওঢ ফুলে কত শোভা।।
রম্ভান্যক্কৃত জানু সুশোভিত অতিশয় নিবিড় নিতম্বা।
করাম্বাম্বর বরকর স্বরধরমাত্র কৃতা জগদম্বা।।
মধ্য সুবঙ্কিম ক্ষীণকেশরিসম ত্রিবলী জঠর ত্রিভঙ্গা।
পীন পয়োধর শঙ্কর মনহর অঞ্জন নিন্দিত অঙ্গা।।[৩৪]

কথকতার মতো জনশিক্ষার এবং বিনোদনের এত শক্তিশালী মাধ্যম ধীরে ধীরে বাংলার সমাজ থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেল। কারণ অনুসন্ধানে আমাদের মনে হয়েছে কোনো একটি কারণে কথকতার প্রচলন কমে যায়নি, বস্তুত একাধিক বিষয়ের সম্মিলনে এটি ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে বলেছেন, অল্প ইংরেজিতে শিক্ষিত স্বধর্মভ্রষ্ট, কদাচারী, দুরাশয় বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোকশিক্ষার আকর কথকতা লোপ পেয়েছে।[৩৫] একজন লেখক বলেছেন, গার্লস্কুলের কল্যাণে একালের মেয়েরা লেখাপড়া শিখে সেকেলে রামায়ণ-মহাভারত আর স্পর্শ করে না। এখন তারা সাহিত্যে আর্ট ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণসূচক নব্য ঔপন্যাসিকদের প্রণীত কামায়ণ পাঠে তৃপ্তি লাভ করেছে, রামায়ণে তাই আর মন ভরে না। সেকালে যারা কথকতা বৃত্তি অবলম্বন করে সংসার প্রতিপালন করত, একালে তাদের বংশধররা অন্য বৃত্তি অবলম্বন করেছে।[৩৬] একটি লেখাতে পাই, গ্রামে ঠাকুরদালান ভেঙে পড়লে যারা মেরামত করত, পুষ্করিণী সংস্কার করত, কথকতা দিত যারা সেই বাবুরা বা ব্যবসায়ীরা কেউ শহরে বা কলকাতায় থাকেন বা নতুন ব্যবসা দিয়েছেন, এদিকে তাদের আর নজর নেই। সাধারণ মানুষের মধ্যেও রুচির পরিবর্তন ঘটেছে, পূর্বে পৌরাণিক উপাখ্যান জনসাধারণের হৃদয়ে যে সরস সজীব ভাবের উল্লাস সৃষ্টি করত, এখন আর এতে তাদের পোষায় না। এখন সমাজ আরো উন্নত ধরনের কিছু আশা করে — সিনেমা — বাস্তব জীবনের ছবি কল্পলোকের ছায়ায় দর্শন করে।[৩৭]

আমরা দেখি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কথকতার মানও ধীরে ধীরে নিম্নমুখী হচ্ছিল। পূর্বে কেউ কথক রূপে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য ভাষা শিক্ষা, ব্যাকরণ, ছন্দ, অলংকারে, সংগীতে পারদর্শী হওয়ার জন্য যে ধরনের পরিশ্রম করতেন, পরে সে ধারা লোপ পেতে শুরু করে। কথকতায় শাস্ত্র তাৎপর্যের চেয়েও রঙ্গরস প্রধান ভূমিকা নেয়। আর আসরে আগ্রহী শ্রোতার কমতিও লক্ষ করা যাচ্ছিল। একজন কথকের বক্তব্যে পাই :

> **যে যত আবোল তাবোল বলতে পারবে সে-ই তত ভাল কথক হে। সে কালের কথকেরা ভাষা শিক্ষা কর্ত্তেন, তাঁদের ব্যাকরণ ছন্দ কাব্য অলংকার জ্ঞান বেশ থাকতো, তবে তাঁরা ভাগবতের কথকতা করবার জন্য ব্রতী হতেন। এখন ছাপা বই থেকে কিছু টুকে নিলে আর নিজের মনোমত কতগুলো গান, ছড়া রচনায় একটু রঙ্গরস করে জমাতে পারলেই হলো। শ্রোতারাও সেই অঙ্গের রগড় দেখ্‌বার জন্য হুজুগে। কাজেই গান আর গল্পই হয় কথকতার প্রধান-তম অঙ্গ। যথার্থ শাস্ত্র তাৎপর্য্য, সে পড়ে থাকে অনেকটা পশ্চাতে। যারা নিছক শাস্ত্র কথা নিয়ে এ বাজারে নামবে তাঁদের জমাতে ঘটাতে একটু বেগ পেতেই হবে। পুরো ধ্রুব প্রহ্লাদের কথা শোনবার লোক খুব কম আর শোনাতে হলেও নতুন করেই শোনাতে হবে।**[৩৮]

পরিশেষে বলা যায়, একদা কোনো 'ভাগবত' পাঠক হয়তো ভাগবতের কাহিনি পাঠ করার সঙ্গো ব্যাখ্যা, আবৃত্তি, গান সমন্বয়ে মনোরঞ্জনকর কাহিনি এবং ঢং মিশ্রণে কথকতার প্রবর্তন করেন। কথকতা এভাবে জনসাধারণের খুবই আদরের সমগ্রী হয়ে ওঠে। কথকেরা সাধারণের উপযোগী সহজ সরল ভাষাতে ধর্মকথা পরিবেশন করে শ্রোতাদের মধ্যে ভক্তির সঞ্চার করে তাদের মনকে সরস, সজীব ও আনন্দে অভিষিক্ত করতেন। জনসাহিত্যের একটি শাখা রূপে কথকতা ব্যাপক পরিমাণে জনপ্রিয়তা লাভ করে। জনশিক্ষার বিস্তারে মাধ্যমটি অগ্রণী ভূমিকা নেয়। কথকতাকে আকর্ষণীয় করার জন্য কথকেরা বিচিত্র বিষয়ের সংযোজন ও সংকলন করতেন। কথকের কাজটি ছিল মূলত শ্রুতিনির্ভর, আবৃত্তি এবং সংগীত তার কর্ম সাধনের প্রধান উপায়। তাই কথককে নির্ভর করতে হতো উপযোগী শব্দবিন্যাস ও তার সুআবৃত্তির উপর। কথকেরা এভাবেই পৌরাণিক কাহিনি আপন কণ্ঠের মাধুরী মিশিয়ে এবং বলবার বিশেষ নাটকীয় ভঙ্গি অবলম্বনে আসরে শ্রোতাদের ভাবে বিভোর করেছেন। আসরে আশ্চর্য সম্মোহনী ক্ষমতা ছিল তাঁদের, পুত্রশোকাতুর, বেদনার্ত মানুষদেরও হাসিয়েছেন অবলীলায়। তাদের আবৃত্তি সংগীত বা গল্প কথন শ্রোতাদের ভক্তিতে বিহ্বল করেছে, কখনো শ্রোতাদের মনে রৌদ্ররসের সঞ্চার করেছে, কখনো করুণ রসের অবতারণায় শ্রোতাদের অশ্রুসিক্ত করেছে, কখনো বা হাস্যরসের অবতারণায় উৎফুল্ল করেছে। অপরদিকে সাধারণ মানুষও এদের সংস্পর্শে এসে তীর্থস্নানের পবিত্রতা লাভ করত। সেই সময়ে কথকতার মাধ্যমে অনেক নিরক্ষর, অল্প শিক্ষিত সাধারণ মানুষ উন্নততর শিক্ষা লাভ করেছিল। কথকেরা একদা হাজার হাজার মানুষের মনে কথার প্রাচুর্যে লোকশিক্ষার স্রোত বহমান রেখেছিলেন। জনচিত্তে আনন্দদানের এই ব্রতের জন্যই কথকেরা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

তথ্যসূত্র:

১. 'কথকতার পুঁথি', হরিপদ চক্রবর্তী, আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪, পৃ. ৫৮০

২. 'কথকতার কথা' প্রাণকিশোর গোস্বামী, শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির, কলকাতা, ১৩৭৫, পৃ. ১২

৩. 'লোকশিক্ষা', বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৪৪৮

৪. 'কথকতা', বিশ্বকোষ ৩য় খণ্ড, সঙ্ক. নগেন্দ্রনাথ বসু, স্বপ্রকাশিত, ১২৯৯, পৃ. ৫৩

৫. ওই

৬. 'কথকতার পুঁথি', হরিপদ চক্রবর্তী, পৃ. ৫৮১

৭. 'কথকতা', বিশ্বকোষ ৩য় খণ্ড, সঙ্ক. নগেন্দ্রনাথ বসু, স্বপ্রকাশিত, ১২৯৯, পৃ. ৫৩

৮. 'সেকালের স্মৃতি', দীনেন্দ্রকুমার রায়, ১ম সং, কলকাতা, আনন্দ, ১৯৩৫, পৃ. ৪২; গোস্বামী, কথকতার কথা, পৃ. ৪৮

৯. 'আমার দেখা কোল্‌কাতা', প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, ১ম সং, দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩৮৭, পৃ. ১৩৫

১০. 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়', 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ' ২য় খণ্ড, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য (সম্পা.), কলকাতা, নাথ ব্রাদার্স, ১৯৮১, পৃ. ১৪

১১. 'সেকালের স্মৃতি', দীনেন্দ্রকুমার রায়, পৃ. ৪২

১২. 'কথকতার কথা', গোস্বামী, পৃ. ১০

১৩. ওই, পৃ. ১০

১৪. 'সেকালের স্মৃতি', দীনেন্দ্রকুমার রায়, পৃ. ৪২

১৫. 'কথকতার কথা', গোস্বামী, পৃ. ১৮-২১

১৬. ওই, পৃ. ২৬

১৭. 'স্মৃতিচিত্র', প্রতিমা দেবী, ১ম সং, কলকাতা, সিগনেট, ১৩৫৯, পৃ. ৮৫-৮৬

১৮. 'কথকতার কথা', গোস্বামী, পৃ. ৩৯

১৯. ওই, পৃ. ৭৩

২০. ‘শ্রীধর কথক’, বাঙ্গালীর গান, দুর্গাদাস লাহিড়ী (সম্পা.), কলকাতা, ১৩১২, পৃ. ২৭৭-২৭৯
২১. ‘বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়’, ‘হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ’ ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫
২২. ‘সেকালের স্মৃতি’, দীনেন্দ্রকুমার রায়, পৃ. ৪২
২৩. ‘জোড়াসাঁকোর ধারে’ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ, কলকাতা, ১৩৫১, পৃ. ৩৯
২৪. ‘ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য’ দীনেশচন্দ্র সেন, কলকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৬০, পৃ. ১৮১
২৫. ‘মন্ত্রশক্তি’,অনুরূপা দেবী, ১০ম সং, কলিকাতা, ১৩৬১, পৃ. ৬৬-৬৭
২৬. ‘ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য’ দীনেশচন্দ্র সেন, পৃ. ১৮১
২৭. ‘কথকতার কথা’, গোস্বামী, পৃ. ২৬-২৭
২৮. ‘সেকালের স্মৃতি’, দীনেন্দ্রকুমার রায়, পৃ. ৪৩
২৯. ‘আমার দেখা কোল্‌কাতা’, প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১৩৫-১৩৭
৩০. ‘কথকতার কথা’, গোস্বামী, পৃ. ২০-২১
৩১. ‘কথকতার পুঁথি’, হরিপদ চক্রবর্তী, পৃ. ৫৮৩
৩২. ওই, পৃ. ৫৮৬
৩৩. ওই, পৃ. ৫৮৮
৩৪. ওই, পৃ. ৫৮৪
৩৫. ‘লোকশিক্ষা’, বঙ্কিম রচনাবলী, পৃ. ৪৪৯
৩৬. ‘সেকালের স্মৃতি’, দীনেন্দ্রকুমার রায়, পৃ. ৪৩
৩৭. ‘কথকতার কথা’, গোস্বামী, পৃ. ৪-৫
৩৮. ওই, পৃ. ১৩৪

লেখক পরিচিতি: অমরেশ বিশ্বাস, গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ।